প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত, জানুয়ারী ১৯৬১

ছোটদের রাজস্থান গ্রন্থমালা - প্রথম গ্রন্থ

শিলাদিত্য

'হেনরী ফোর্ড', 'দানবীর কার্ণেগী', 'দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান'
প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি-এস-সি

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

মার্চ
১৯৬১
৩

ছেপেছেন—
এস. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

শিলাদিত্য

এক

সে প্রায় আঠার শত বৎসর পূর্বের কথা!

কনকসেন নামে এক রাজপুত রাজা সৌরাষ্ট্র দেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন, 'বল্লভী' ছিল তাঁহার রাজধানী। কনকসেন সূর্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-অবতার ভগবান রামচন্দ্রের বংশধর তিনি। শ্রীরামচন্দ্র বা তাঁহার পূর্ব-পুরুষদের রাজত্বকালে সূর্যবংশের রাজাদের যে প্রতাপ-প্রতিপত্তি ছিল, কনকসেনের যুগে তাহা অবশ্যই অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। তথাপি রামচন্দ্রের বংশধর রাজপুত রাজারা তখনও শৌর্য-বীর্য-প্রভুত্ব হইতে একেবারে বঞ্চিত হন নাই।

শৌর্য-বীর্য, কর্তব্য-নিষ্ঠা ও সর্বোপরি স্বদেশ-প্রেমের জন্য রাজপুত জাতি ভারতের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছেন। জননী জন্মভূমিকে তাঁহারা যে শুধু মুখেই স্বর্গাদপি গরীয়সী আখ্যা প্রদান করিতেন তাহা নহে। স্বদেশ ও স্বজাতির

স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহারা সর্বদাই যে অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন, তাহা স্মরণ করিলে আজিও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। স্বদেশের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য অনশন, অর্ধাশন প্রভৃতি কোন কস্টকেই তাঁহারা কস্ট বলিয়া মনে করিতেন না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা সর্বপ্রকার সুখভোগ অক্লেশে বিসর্জন দিয়া হাসিমুখে শত্রুর উন্মুক্ত কৃপাণের সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইতেন, ধমনীতে এক বিন্দু শোণিত থাকিতে শত্রুর সহিত সংগ্রামে ক্ষান্ত হইতেন না। হয় বিজয়মাল্য, নয় মৃত্যু এই ছিল তাঁহাদের পণ।

রাজপুত পুরুষের মত রাজপুত নারীরাও ছিলেন স্বদেশ-প্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত। রাজপুত জননী হাসিমুখে তাঁহার প্রাণ-প্রিয় পুত্র-কন্যাকে স্বদেশ-জননীর বেদীমূলে উৎসর্গ করিতেন, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজপুত বীরাঙ্গনা অকম্পিত হৃদয়ে স্বামীকে যুদ্ধের বেশে সজ্জিত করিয়া দিতেন, প্রয়োজন হইলে মর্যাদা রক্ষার জন্য রাজপুত সতী অম্লান বদনে অগ্নিকুণ্ডে আত্মদান করিয়া জহরব্রত পালন করিতেন। দেশের আহ্বানে যে রাজপুত সাড়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করিত, রাজপুতদের চোখে সে ছিল কুলাঙ্গার। মাতা তেমন কুলাঙ্গার পুত্রের জন্য ধিক্কার বোধ করিতেন, স্ত্রী তেমন কাপুরুষ স্বামীর জন্য মরমে মরিয়া যাইতেন।

সে ছিল রাজপুত ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ। এক একটি রাজপুত বালক যেন এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেশপ্রেমের ঘৃতাহুতি-সংযোগে যে উজ্জ্বল অগ্নিশিখার সৃষ্টি করিত, তাহার বিভায় দশদিক্ আলোকিত হইত। শত্রুরাও এই বীর জাতির বীরত্ব ও আত্মত্যাগের নিকট শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিত।

রাজপুত বীরদের সেই বীরমহিমায় রাজস্থান গৌরবান্বিত হইয়াছে, রাজস্থানের সেই অতীত গৌরবে ভারত ও ভারতবাসী ধন্য বোধ করিয়াছে। রাজপুত বীর ও রাজপুত রমণীর বীরত্ব এবং ত্যাগের কাহিনীতে ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠা অপূর্ব মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

আজ সে রাজপুতানা নাই, রাজস্থানে আজ সে রাজপুত বীরও নাই। আজ রাজপুত বীরের সে অসির ঝংকার নাই, রাজপুত-অন্তঃপুরে সে জহরব্রতও নাই! কালচক্রের আবর্তনে রাজপুত জাতি আজ পূর্ব গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, শুধু সে গৌরবের স্মৃতিই আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সে স্মৃতির ধ্যান করিলে আজও যেন সেই অতীতের অন্ধকার গহ্বর হইতে রাজপুত বীরেরা নব রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন!

* * * *

কনকসেন যে সময় বল্লভীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, সে সময় ভারতবর্ষে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। ক্ষুদ্র কয়েকটি গ্রাম, তাহারই নাম হইত রাজ্য। আর সেই কয়েকটি গ্রামের যিনি অধিপতি, তিনিই হইতেন রাজা। যখন যিনি ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেন, তিনিই তখন ক্ষুদ্র একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজা হইয়া বসিতেন; কিংবা অন্য কোন দুর্বল রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিতেন। কাজেই সে সময় রাজায় রাজায় যুদ্ধ-বিগ্রহ একরূপ লাগিয়াই থাকিত। আজ একজন রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতেছেন, কালই হয়ত আর এক রাজা আসিয়া তাঁহাকে পথের ভিখারীতে পরিণত করিলেন।

রাজায় রাজায়, জ্ঞাতি-কুটুম্বে এইরূপ অন্তর্যুদ্ধ ত' ছিলই, তদুপরি বিদেশী বিধর্মী শত্রুরাও ভারতের ধনৈশ্বর্যের লোভে মাঝে মাঝে উল্কার মত আসিয়া অকস্মাৎ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিত। ক্ষুদ্র রাজাদের না ছিল পর্যাপ্ত শক্তি, না ছিল পরস্পরের মধ্যে একতা। কাজেই শত্রুরা অনায়াসেই এই সকল রাজাদের ধনসম্পদ্ লুণ্ঠন করিয়া লইত, কেহ কেহ আবার তাহাদের রাজসিংহাসন দখল করিয়া রাজত্বও করিত।

যাহা হৌক, এ দুর্দিনেও রাজা কনকসেন ও তাঁহার বংশধরগণ বহুদিন পর্যন্ত নিষ্কণ্টকে বল্লভীর সিংহাসনে বসিয়া

রাজত্ব করিয়াছিলেন। পর পর সাত জন রাজা রাজত্ব করার পর শিলাদিত্য বল্লভীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালেই বল্লভী নগরী ম্লেচ্ছদের করতলগত হয়, তিনি নিজেও তাহাদের হাতে প্রাণ হারান।

আজ তোমাদিগকে সেই রাজা শিলাদিত্যের জীবন-কথাই বলিব।

দুই

বল্লভীপুরে বহুদিন হইতেই সূর্যকুণ্ড নামে একটি পবিত্র জলাশয় ছিল। সেই কুণ্ডের পার্শ্বে গ্রহরাজ আদিত্যদেবের একটি মন্দির ছিল। ভাস্বর-সূর্যের মতই মহা তেজস্বী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই সূর্য-মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একা, তাঁহার জীবন ছিল সাংসারিক বন্ধন-বিমুক্ত। স্বীয় আরাধ্য ইস্টদেব গ্রহরাজ আদিত্য ব্যতীত ত্রিসংসারে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আর কেহই ছিল না। ব্রাহ্ম-মুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি স্বহস্তে মন্দির মার্জনা করিতেন, গ্রহরাজের পূজার জন্য বন-কুসুম চয়ন করিতেন, ভক্তিপূত অন্তরে আদিত্যের পূজা, আরতি ও উপাসনা করিতেন, আর দিনের শেষে সামান্য

ফলমূলে উদরতৃপ্তি করিয়া মন্দিরের এক পার্শ্বেই নিদ্রার কোলে বিশ্রাম লাভ করিতেন।

এই ভাবেই দিন কাটিতেছিল। অকস্মাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে ব্রাহ্মণের জীবনসূত্রে এক নূতন গ্রন্থি পড়িল। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও তিনি ব্রাহ্ম-মুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিয়া মন্দির-চত্বরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় বিলীয়মান অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, একটি যুবতী অত্যন্ত সংকুচিতভাবে সোপানতলে দাঁড়াইয়া আছেন। মলিন মুখ ও মলিন বসন ভেদ করিয়াও তাঁহার অন্তরের পবিত্রতা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

ব্রাহ্মণ সদয়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে মা? এ বয়সেই তোমার এ বিধবার বেশ কেন?"

যুবতী বিনম্র মধুর বচনে উত্তর দিলেন, "প্রভু! আমি গুর্জর রাজ্যের কৈয়র নগরের বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ দেবাদিত্যের অভাগিনী কন্যা। বাপ-মা আমার নাম রেখেছিলেন সুভগা, কিন্তু বিয়ের রাত্রেই আমি বিধবা হওয়ায় সবাই আমায় দুর্ভাগা বলে ডাকে। আমার দুর্ভাগ্যের জন্য শ্বশুরগৃহে আমার আর স্থান নেই! মা ছিলেন, তিনিও আমার শোচনীয় দুঃখে মর্মাহত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। শ্বশুর-কুল থেকে বিতাড়িত, পিতৃ-মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত অভাগিনী কন্যাকে একটু আশ্রয় দিন প্রভু!"

ব্রাহ্মণ বিষণ্ণ হাস্যে বলিলেন, "গৃহহীন, বিত্তহীন, ফলমূলাহারী, দরিদ্র পূজারী-ব্রাহ্মণ, সূর্য-মন্দিরে পড়ে থাকি, আমার আশ্রয়ে কি সুখ পাবি মা ?"

সুভগা আর্তস্বরে উত্তর দিলেন, "আমায় তাড়িয়ে দেবেন না প্রভু! আমি শুধু একটু আশ্রয় চাই, সুখের কামনা আর আমার নেই!"

বলিতে বলিতে সুভগার নয়নপটে ভাসিয়া উঠিল তাঁহার দেবদুর্লভ স্বামীর কমনীয় মূর্তি, এক রাত্রির পরিচয় হইতে না হইতেই ভগবানের অভিশাপে যাঁহার সহিত তাঁহার চির-বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল!

সেই বিষাদ-মলিন মূর্তি, অথচ তাহার মধ্যেই যেন কেমন এক অসাধারণ তেজো-দীপ্তি! ব্রাহ্মণ মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার চিরশুষ্ক হৃদয়ও আর্দ্র হইয়া উঠিল।

স্নেহের স্বরে আশ্বাস দিয়া তিনি বলিলেন, "তবে তাই হোক্ মা! এখানেই থাক্।"

সুভগা কৃতজ্ঞ অন্তরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

অভাগিনী সুভগার আশ্রয় মিলিল!

তিন

সুভগা সূর্য-মন্দিরেই থাকেন। মন্দিরের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও বৃদ্ধ পুরোহিতের সেবায়ই তাঁহার নিঃসঙ্গ দিন নীরবে অতিবাহিত হয়।

কিন্তু এইটুকু সুখও সুভগার ভাগ্যে বেশী দিন স্থায়ী হইল না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শেষ দিন উপস্থিত হইল। আদিত্য-মন্দিরের যাবতীয় ভার সুভগার উপর অর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণ আদিত্য-মন্ত্র জপ করিতে করিতেই চক্ষু বুজিলেন। সুভগার সেবাযত্নে পরিতুষ্ট হইয়া মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহাকে সূর্যদেবের বীজমন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়া গেলেন। সে মন্ত্রের এমন তেজ যে, শুদ্ধাচারে ও সংযতচিত্তে উহা জপ করিলে ভগবান আদিত্য স্বয়ং ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হন, ভক্তকে তাঁহার অভীষ্ট বর প্রদান করেন। কিন্তু এক বিপদ এই যে, এই মন্ত্র জীবনে একবারের বেশী দুইবার উচ্চারণ করিলেই মৃত্যু অবধারিত।

পুরোহিত না থাকায় সুভগা একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন। বনের পাখী তাঁহাকে গান শুনায়, বসন্তের বাতাস তাঁহার কানে কানে কথা কয়, ফুলের সুবাস তাঁহার সহিত লুকোচুরি খেলে। তাহারা ছাড়া আর কেহ সঙ্গী তাঁহার নাই।

এক এক সময় এই নিঃসঙ্গ জীবন যেন সুভগার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিত। একটা কচি ছেলে থাকিলেও তাহাকে আদর করিয়া চুমা খাইয়া হৃদয়ের এই বিরাট শূন্যতাকে কথঞ্চিৎ পূর্ণ করা যাইত। কিন্তু ভগবান তাঁহাকে সে দিকেও বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

এই দুঃসহ নির্জনতা সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন সুভগা এক দুঃসাহসিক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। কুণ্ডের জলে স্নান করিয়া তিনি শুদ্ধ, শান্ত চিত্তে সূর্যমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

চক্ষের পলকে এক আশ্চর্য ব্যাপার! সুভগা দেখিলেন, অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ময় রূপে সমগ্র বনস্থলী আলোকিত করিয়া ভগবান মরীচিমালী স্বয়ং সুভগার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। জ্যোতির্ময় দেবতার সে কি জ্যোতিঃ! সুভগা সে জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "তোমার এ তেজ সংবরণ কর প্রভু!"

ভগবান্ আদিত্য মধুর স্বরে বলিলেন, "তোমার আহ্বানে তোমার কাছে প্রকাশ না হয়ে উপায় নেই। তুমি মনোমত বর প্রার্থনা কর।"

সুভগা কি বর চাহিবেন তাহা যেন ভাবিয়াই পাইলেন না। শেষে অকস্মাৎ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল—



—"এখানের এই নিঃসঙ্গ জীবন আর বহন করিতে পারি না দেব!"

"এখানের এই নিঃসঙ্গ জীবন আর বহন করিতে পারি না দেব! এ বুকের শূন্যতা আর সহ্য হয় না! এ শূন্য বুক পূর্ণ ক'রে দাও প্রভু! একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, এই আমার প্রার্থনা!"

"তথাস্তু!" বলিয়া সূর্যদেব অন্তর্হিত হইলেন।

দেবতার বাক্য মিথ্যা হইবার নয়। সুভগার কোল আলো করিয়া দুইটি যমজ ছেলেমেয়ে আসিল। ছেলেটি বড়, মেয়েটি ছোট। ছেলেটি সূর্যরশ্মির মত দীপ্তিমান্, মেয়েটি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত লাবণ্যময়ী। সুভগা মন্দিরের কঠিন শিলাতলে শয়ন পাতিয়া ছেলেমেয়ে দুটিকে বুকের কাছে টানিয়া লন, তাহাদের চাঁদ-মুখের দিকে তাকাইয়া কত কথা ভাবেন।

সূর্যদেবের দয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে এক এক সময় তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসে!

চার

পুত্রের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন সুভগা তাহাকে পাঠশালায় ভরতি করিয়া দিলেন। কিন্তু দুর্দান্ত ছেলের লেখাপড়ার নামেই গায়ে জ্বর আসিত; তাহার যত উৎসাহ ছিল খেলাধুলায়। নিত্য নূতন খেলা আবিষ্কার করিয়া

সহপাঠীদিগকে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া দেওয়াই ছিল তাহার প্রধান আনন্দ।

এই উপলক্ষ করিয়াই শেষে মহা অনর্থের সূত্রপাত হইল। পাঠশালার ছুটির পর একদিন স্থির হইল যে, 'রাজা রাজা' খেলিতে হইবে। সকল বালক মিলিয়া সুভগার পুত্রকেই রাজা নির্বাচন করিল।

কাছেই একটা চাঁপা গাছের তলায় একটু উঁচু মাটি ছিল। তাহারই উপর লতাপাতা বিছাইয়া রাজসিংহাসন নির্মিত হইল। রাজা সিংহাসনে বসিতে যাইবেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ-বালক প্রস্তাব করিল, "সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে অভিষেক হওয়া রাজ-নীতি। আমি ব্রাহ্মণ, আমি মন্ত্র প'ড়ে রাজার কপালে রাজটিকা পরিয়ে দেব, তবে ত' অভিষেক হবে।"

এই প্রস্তাবে সকলেই উল্লসিত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ-বালক গলার পৈতায় আঙ্গুল জড়াইয়া বলিল, "রাজা, তোমার বাবার নাম ও বংশ-পরিচয় বল।"

রাজা মহা মুশকিলে পড়িয়া গেলেন। মার মুখে ত' কোন দিন পিতার নাম শোনেন নাই, কাজেই কি পিতৃ-পরিচয় দিবেন! তাহার চোখমুখ কালো হইয়া গেল। তিনি শুধু বলিলেন, "আমার মার নাম সুভগা, তিনি সূর্য-মন্দিরের সেবিকা। আর আমার একটি ছোট বোন আছে, সেও

মার কাছেই থাকে। এ ছাড়া ত' বাবাকে কোন দিন দেখি নি!"

সকল ছেলেই তাঁহার এই উত্তরে হাসিয়া উঠিল। বলিল, "বাপকে না হয় দেখ নি, কিন্তু তাই বলে তাঁর নামও কি জান না?"

লজ্জায় অধোবদন হইয়া ক্ষুদে রাজা উত্তর দিলেন যে,—পিতার নাম তিনি জানেন না। মার নিকট হইতে কোন দিন সে-নাম জানিতে পারেন নাই।

আর যায় কোথায়? ছেলের দল উপহাসে-বিদ্রূপে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। একজন বলিল, "বাপের নাম জানে না! ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জার কথা! সাধে কি আর বাছাধনের 'গয়বী' নাম রাখা হয়েছে!"

গয়বী শব্দের অর্থ 'গুপ্ত'। সহপাঠীদের এই কদর্য ইঙ্গিতে গয়বী ক্ষিপ্ত হইয়া মার নিকট ছুটিয়া গেলেন।

অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মি তখন মন্দির-চূড়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছে, সুভগা সূর্যদেবের আরতির আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় গয়বী ঝড়ের বেগে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বাবা কে মা? কতদিন জিজ্ঞেস ক'রেও কোন জবাব পাই নি। আজ যদি বাবার নাম না বল, তবে তোমাকে খুন ক'রে ফেলব।"

সুভগা প্রমাদ গণিলেন, গয়বীর ছোট বোন দাদার এই ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সুভগা উত্তেজিত পুত্রকে নানা কথায় ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! গয়বীর মুখে শুধু একই কথা—"বাবার নাম কি? তিনি কোথায় আছেন বল।"

সুভগা কি উত্তর দিবেন! কেমন করিয়া ছেলেকে বুঝাইবেন, সূর্যের বরে তাঁহার জন্ম হইয়াছে!

জননীর ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া গয়বীর ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়া গেল। ক্রুদ্ধ বালক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সুভগার মস্তক লক্ষ্য করিয়া এক পাথর ছুঁড়িয়া মারিলেন। সুভগার মাথায় না লাগিয়া উহা সূর্যমূর্তির গায়ে আঘাত করিল।

দুর্দান্ত পুত্রের এই উন্মত্ত আচরণে জননীর হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। পুত্রের এই রূঢ় আচরণের জন্য মনে মনে সূর্যদেবের নিকট শতবার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, "গয়বী, একটু ঠাণ্ডা হ'। এখনই তোর পিতার দেখা পাবি। কিন্তু আমাকে চিরজন্মের জন্য হারাতে হ'বে। সে-কথা ভেবে দেখ্।"

একগুঁয়ে ছেলের তখন কি আর কোন কথা ভাবিবার মত ধৈর্য আছে? গয়বী অবিচলিত দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,

"আমি কোন বাজে কথা শুনতে চাইনে। বাবা কোথায় আছেন তাই বল।"

"বেশ, তবে তাই শোন্" বলিয়া সুভগা সূর্য-মন্দিরের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। সেই প্রায়ান্ধকার কক্ষে স্বল্প ক্ষীণালোকে পদ্মাসনে বসিয়া তিনি দ্বিতীয়বার সূর্যমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।

অন্ধকার কক্ষ দিব্য বিভায় আলোকিত হইয়া উঠিল। বিস্মিত গয়বীর নয়ন-সম্মুখে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। সুভগা সেই মূর্তিকে লক্ষ্য করিয়া করজোড়ে বলিলেন, "প্রভু! গয়বী তার পিতৃপরিচয় জানতে চায়! তুমি তাকে সে পরিচয় দাও, দেব!"

সূর্যদেব তখন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে গয়বী ও তাহার ভগিনীর জন্ম-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তিনিই তাহাদের পিতা। গয়বীর হস্ত নিক্ষিপ্ত যে শিলাখণ্ড সূর্যমূর্তির গায়ে লাগিয়াছিল, তাহাই গয়বীর হাতে দিয়া তিনি বলিলেন, "এই আদিত্যশিলা দিয়ে তুমি যাকে আঘাত করবে, তারই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। তুমি মনে মনে আমাকে স্মরণ করলেই ওই সূর্যকুণ্ড থেকে সপ্তাশ্ব রথ উঠে আসবে। সেই রথে চড়ে তুমি যে যুদ্ধেই যাবে, সেই যুদ্ধেই তোমার জয়লাভ অনিবার্য! বিজয়ী হও বৎস! পিতৃকুল উজ্জ্বল কর!"

এই বলিয়াই সূর্যদেব অন্তর্হিত হইলেন। সূর্য-মন্দির আবার আগের মতই অন্ধকার হইয়া উঠিল। গয়বী মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেখেন, সূর্যের তেজে সুভগার দেহ জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।

গয়বী মায়ের শোকে কিছুক্ষণ কাঁদিয়া ভাসাইলেন। তাহার পরই তিনি সেই আদিত্যশিলা হস্তে মন্দির হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ছোট বোনটি যে মন্দিরে একাকী পড়িয়া রহিল, সে কথা তাঁহার মনেই রহিল না।

পাঁচ

পাঠশালার ছেলেদের অপমানের কথা গয়বীর মনে লাগিয়াই ছিল, তাই তিনি সেই নিদারুণ শিলার স্পর্শে প্রথমেই উপহাসকারী বালকদের প্রাণ সংহার করিলেন। শুধু যে কয়জন বালক গয়বীর পক্ষে ছিল, তাহারাই বাঁচিয়া গেল।

পুত্রহারা পিতার দল একযোগে রাজদরবারে গয়বীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিলেন। রাজার আদেশে গয়বী দরবারে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে সেই

আদিত্যশিলা পরিত্যাগ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

অবাধ্য গয়বী রাজার সে অনুরোধে কর্ণপাত না করিলে রাজা অবশেষে তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল। গয়বী শিলাঘাতে রাজাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং তাহার সিংহাসন অধিকার করিলেন। তদবধি তাহার নাম হইল 'শিলাদিত্য'।

বল্লভীর সিংহাসনে বসিয়া শিলাদিত্যের মনে রাজ্যজয়-স্পৃহা জাগিয়া উঠিল। প্রাণঘাতী আদিত্যশিলা যাঁহার করায়ত্ত, সপ্তাশ্ব রথ যাঁহার আজ্ঞাবহ, তাহার মনে এ বাসনা জাগিয়া উঠিবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

দিগ্বিজয়ের সংকল্প করিয়া অবশেষে রাজা শিলাদিত্য একদিন কুণ্ডের নিকটে গিয়া সূর্যদেবের উপাসনা আরম্ভ করিলেন। সূর্যের কৃপায় কুণ্ড হইতে সপ্তাশ্ব রথ উঠিয়া আসিল। সে রথের কি চমৎকার কারুকার্য! সপ্তাননবিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড দিব্য তুরঙ্গম ছিল সে দেবরথের বাহন। তাহার নাম ছিল সপ্তাশ্ব। কি তার শক্তি! কি তার তেজ! সেই সপ্তাশ্ব-বাহিত রথ যেন বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল।

শিলাদিত্য সেই রথে চড়িয়া রাজ্যজয়ে বাহির হইলেন। যে রাজ্যে যান, সূর্যের বরে সেই রাজ্যের রাজাই তাঁহার

নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। এই ভাবে তিনি অর্ধেক পৃথিবী জয় করিয়া বহু সৈন্য-সামন্ত ধনরত্ন লইয়া বল্লভী নগরীতে ফিরিয়া আসিলেন।

বল্লভী রাজ্যের পূর্ব রাজাকে অকারণে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করায় রাজ্যের সমুদয় প্রজা এতদিন নূতন রাজাকে বড় সুনজরে দেখিতেন না। কিন্তু শিলাদিত্যের এই অতুলনীয় পরাক্রমের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের মনে আর তাঁহার সম্বন্ধে কোন ক্ষোভ রহিল না। তাই শিলাদিত্য যখন দিগ্বিজয়ী বেশে বল্লভী নগরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সমস্ত প্রজা "জয় মহারাজ শিলাদিত্যের জয়" বলিয়া তাঁহাকে সংবর্ধনা করিয়া লইলেন।

শিলাদিত্যও লুণ্ঠিত ধনরত্ন সমুদয় রাজকোষে জমা না করিয়া কিয়দংশ নগরের দুঃস্থ প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। দুঃখী প্রজারা রাজার এই সহৃদয়তার জন্য দু'হাত তুলিয়া ভগবানের কাছে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতে লাগিল।

শিলাদিত্যের সুশাসনে বল্লভী রাজ্যে আর কোন দুঃখ-কষ্ট রহিল না।

ছয়

সিংহাসনে বসিয়া রাজ্যের পর রাজ্য জয়ের নেশায় শিলাদিত্য তাঁহার মাতৃহারা বোনকে এতদিন ভুলিয়াই ছিলেন। অকস্মাৎ আজ এত দিন পরে তাহার কথা মনে পড়িল।

বসন্তের মধুর অপরাহ্ন। শুষ্ক পার্বত্য প্রদেশেও প্রস্ফুটিত কুসুমের স্নিগ্ধ সমারোহ। বসন্ত-সমীরণ কুসুম সুবাসে সুরভিত হইয়া মৃদুমন্দ বহিয়া যাইতেছে। শিলাদিত্য মধুর আলস্যে রাজরথে দেহভার এলাইয়া দিয়া কত কি ভাবিতেছিলেন ছায়াচিত্রের মত তাঁহার মানসপটে একে একে অতীতের কত চিত্রই না ফুটিয়া উঠিতে লাগিল! আজ তাহার মা থাকিলে কত আনন্দই না হইত! কিন্তু কোথায় জননী! তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই ত' জননীকে অকালে হারাইতে হইয়াছে। ছোট একটা বোন—এতদিন তাহারও কোন সন্ধান নেওয়া হয় নাই!

আজ সে বোনটি না জানি কোথায় কি অবস্থায় আছে! শিলাদিত্য ব্যাকুল চিত্তে ভগিনীর সন্ধানে সূর্যমন্দিরের দিকে ছুটিয়া চলিলেন।



—"কোথায় বোন, আয় আয়।"

গিয়া দেখেন মন্দির আর সে মন্দির নাই। বন্য লতায় তাহার সর্বদেহ আচ্ছাদিত। কোন কোন জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে। শিলাদিত্য ভগিনীর নাম ধরিয়া বার বার ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় বোন, আয় আয়!"

প্রতিধ্বনি প্রত্যেকবারই উত্তর দিতে লাগিল, "কোথায় বোন, নাই নাই!"

শিলাদিত্য কতজনের কাছে ভগিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কোন সন্ধান দিতে পারিল না। হতাশ চিত্তে তিনি রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

রাজা তখন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্বর্ণকারকে ডাকিয়া সূর্যমন্দিরের চারিদিক স্বর্ণমণ্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। সে আদেশ প্রতিপালিত হইতে বিলম্ব হইল না। স্বর্ণকিরীটা স্বর্ণ-মণ্ডিত সূর্য-মন্দির সূর্য-কিরণে আবার হাসিতে লাগিল।

কিন্তু হায়! সে হাসির সহিত হাসি মিলাইতে ছোট বোনটি আর ফিরিয়া আসিল না।

সাত

তখনকার দিনে পরাক্রমশালী রাজাদের এক একজনের শত শত মহিষী থাকিত। শিলাদিত্যের মহিষীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। তিনি যখন যে রাজ্য জয় করিতেন, মনোমত হইলে সেই রাজ্যের রাজকন্যাকেই বিবাহ করিয়া আনিতেন। এমন বীর জামাতার হাতে কন্যা সম্প্রদান করিতে কোন্ পিতারই বা আপত্তি হয়? এমন মহাদেবের মত স্বামীর গলায় বরমাল্য দিতে কোন্ কুমারীরই বা কুণ্ঠা জাগে? শিলাদিত্যকে জামাতারূপে পাইয়া কন্যার পিতারা যেমন গৌরব বোধ করিতেন, তাঁহার মত বীর-পুরুষের পত্নী হইয়া রাজকুমারীরাও তেমনই তাঁহাদের শিবপূজা সার্থক জ্ঞান করিতেন।

শিলাদিত্যের মহিষীদের মধ্যে চন্দ্রাবতী নগরের রাজকুমারী পুষ্পবতী ছিলেন অন্যতম। মহিষীর পুষ্পবতী নাম সত্য সত্যই সার্থক হইয়াছিল। পুষ্পের মতই পেলব, পুষ্পের মতই সুষমাময়, চম্পক-কুসুমবর্ণা তন্বী পুষ্পবতীর দেবদুর্লভ রূপ বল্লভীর রাজ-অন্তঃপুরের গর্বের বিষয় ছিল।

এমন লক্ষ্মী-প্রতিমাকে কাহার হাতে অর্পণ করিবেন, বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত তজ্জন্য মাতাপিতার মনে দুশ্চিন্তার

অবধি ছিল না। শেষে যে দিন রাজা শিলাদিত্য চন্দ্রাবতী-রাজের নিকট পুষ্পবতীর পাণিপ্রার্থনা করিলেন, সে দিন তিনি যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। শুভদিনে শিলাদিত্যের সহিত পুষ্পবতীর শুভ পরিণয় হইয়া গেল। সহকার-তরু-দেহে মাধবীলতা শোভা পাইল!

পুষ্পবতীর যে শুধু বাহিরের রূপই ছিল, তাহা নহে। বাহিরের মত তাঁহার ভিতরটিও অপূর্ব মাধুর্যময় ছিল। ফুলের মতই তাহার কোমল হৃদয় দীনদুঃখীর দুঃখের কথা শুনিলে গলিয়া যাইত। ব্যথিতের ব্যথা দর্শনে তাঁহার দুই চক্ষে শ্রাবণের ধারা বহিয়া যাইত!

শিলাদিত্যও মহিষী পুষ্পবতীকে প্রাণাপেক্ষা ভাল-বাসিতেন। যতদিন বল্লভীপুরীতে থাকিতেন, ততদিন তিনি তাঁহাকে এক দণ্ডের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল করিতেন না। শেষে পুষ্পবতী যখন সন্তানসম্ভবা হইলেন, তখন তাঁহার পিতা কন্যাকে চন্দ্রাবতীতে আনয়ন করিবার জন্য শিলাদিত্যের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন।

পিতৃকুলের অধিষ্ঠাত্রী ভবানীদেবীর মন্দিরে পূজা দিয়া তাঁহার নিকট পুত্র-বর প্রার্থনা করিবেন, পুষ্পবতীর মনে কিছুদিন হইতেই এ সাধ জাগিয়াছিল। শিলাদিত্য মহিষীর এ সাধে অন্তরায় হইতে ইচ্ছা করিলেন না।

তাহা ছাড়া সিন্ধুতটবর্তী শ্যামনগরের পারদ জাতি শীঘ্রই বল্লভীরাজ্য আক্রমণ করিবে এমন আশঙ্কাও ছিল। শিলাদিত্যের মনে তজ্জন্য কোন ভয় না জন্মিলেও মহিষীকে তিনি যুদ্ধের কোলাহল হইতে দূরে রাখাই সমীচীন মনে করিলেন।

চন্দ্রাবতী-রাজ্য ছিল বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের গায়। শিলাদিত্য ভাবিলেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষ হইলে তিনি নিজেও কিছুদিন শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া আসিবেন। চন্দ্রাবতীর রাজার মর্মর প্রাসাদে পুষ্পবতীর পার্শ্বে বসিয়া শৈল-সমীরণ উপভোগ করার সুমধুর কল্পনায় শিলাদিত্য মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পুষ্পবতী পিতৃরাজ্যে যাইবার জন্য শিবিকায় আরোহণ করিবেন, এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু অকারণে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তিনি ক্ষণেকের জন্য শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু মাতাপিতার চরণ দর্শনের আশায় তাঁহার হৃদয় সত্বরই আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল!

এ কিছুই নয়, বলিয়া তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠুর বিধি সকলের অলক্ষ্যে বসিয়া ক্রূর হাসি হাসিলেন।

আট

দিগ্বিজয়-শেষে শিলাদিত্য যখন প্রজাদের মধ্যে ধনরত্ন বিতরণ করিয়া দিতেছিলেন, তখন প্রধান মন্ত্রী আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহার ভাগ্যেও এ-যাত্রা খুব মোটা রকমের পুরস্কার মিলিবে।

কিন্তু শিলাদিত্য সে দিক দিয়াও গেলেন না। বিদেশী রাজ্য হইতে যে সব ধনরত্ন আনিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই কেবল দুঃখী প্রজাদের মধ্যেই বিলাইয়া দিলেন। সেনাপতি, মন্ত্রী!—তাঁহাদের ত' আর অর্থের অভাব নাই, কাজেই শিলাদিত্য তাঁহাদের কিছু দেওয়া প্রয়োজনই মনে করিলেন না।

মন্ত্রী মনে মনে রাজার উপর চটিয়া গেলেন।

রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী!—সম্পদে, বিপদে, মন্ত্রণা-কৌশলে রাজার দক্ষিণ হস্ত! কত সম্মান, কত মর্যাদা! কিন্তু হইলে কি হয়, তিনি ছিলেন একটি অর্থগৃধ্নু, পিশাচ! অর্থের জন্য কোন কুকর্ম্ম করিতেই তাঁহার বিবেকে বাধিত না।

শিলাদিত্য এ-সবের কোন খোঁজই রাখিতেন না। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তিনি তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস

করিতেন। সরলভাবে সকল গোপনীয় কথা নিয়া তাহার সহিত আলোচনা করিতেন। এমন কি, যে সপ্তাশ্ব রথের রহস্য রাজ্যের অন্য কেহ জানিত না, তিনি সে কথাও মন্ত্রীর নিকট গোপন করেন নাই।

কিন্তু এই বিশ্বাস করাই তাহার কাল হইল। বিশ্বাসহন্তা মন্ত্রী অন্নদাতা রাজার সর্বনাশ সাধন করিলেন। বল্লভী রাজ্যের স্বাধীনতাকে এই স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গার বিদেশী শত্রুর হাতে তুলিয়া দিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, রাজা শিলাদিত্যের সুশাসনে বল্লভী রাজ্যের দিন দিনই উন্নতি হইতে ছিল। তাহার অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি প্রতিবেশী অনেক রাজারই ঈর্ষ্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শিলাদিত্যের বিক্রমের ভয়ে কেহই সে-রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহস পাইত না।

এ সময় সিন্ধু নদের তীরে শ্যামনগরে পারদ নামে এক দুর্ধর্ষ অসভ্য জাতি বাস করিত। বহুদিন হইতেই বল্লভী নগরের ধনসম্পদের উপর তাহাদেরও লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাহারা কেবলই সুযোগ সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। কৃতঘ্ন মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে এতদিনে তাহাদের সে সুযোগ মিলিল।

সূর্যকুণ্ডের সপ্তাশ্ব রথই যে শিলাদিত্যের শক্তির উৎস, এবং

সেই কুণ্ডটি কোনরূপে অপাদন হইয়া গেলেই যে আর সে দেবরথ পাওয়া যাইবে না, দেশের শত্রু মন্ত্রিবর সামান্য অর্থের বিনিময়ে পারদ জাতির নিকট সেই সুগোপন তথ্য বিক্রয় করিলেন।

এ সন্ধান পাওয়ার পর পারদগণ আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া বল্লভা রাজ্য আক্রমণ করিল, এবং বল্লভীপুরে পৌঁছিয়াই গুপ্তচর দ্বারা গো-রক্ত সিঞ্চনে পবিত্র সূর্যকুণ্ডকে অপবিত্র করিয়া ফেলিল।

নগর-প্রান্তে শত্রু-সমাবেশ দেখিয়া রাজা শিলাদিত্য পূর্বের মত কুণ্ড-তীরে দাঁড়াইয়া সূর্যদেবকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু রাজার ব্যাকুল মিনতিতে এবার কোন ফলই হইল না। অপবিত্র কুণ্ড হইতে রথ আর উঠিল না!

এরূপ একটা সংকট যে উপস্থিত হইতে পারে, এমন কল্পনাই শিলাদিত্যের মস্তিষ্কে কখনও স্থান পায় নাই। সূর্যদেব তাঁহার ইষ্টদেবতা, তাঁহার পিতা; সূর্যদেবতারই বরে শিলাদিত্য আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ বীররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; সেই করুণাময় ভাস্কর আজ কী কারণে অকস্মাৎ বিরূপ হইলেন?

অনেক চিন্তার পর, শিলাদিত্য মন্ত্রীকে আহ্বান করিলেন। প্রতিহারী ছুটিয়া গেল মন্ত্রীর ভবনে। কিন্তু অত্যল্প কালের



—এক বর্শার আঘাতে তিনি রণক্ষেত্রে লুটাইয়া পড়িলেন

ভিতরই সে আবার ছুটিয়াই ফিরিয়া আসিল। এবং সে ফিরিল একাকী। মন্ত্রী গৃহে নাই।

শিলাদিত্যের অন্তরে ঘোর সন্দেহের উদয় হইল। রাজধানী যখন শত্রুবেষ্টিত, তখন প্রধান অমাত্যের কর্তব্য হইতেছে রাজার সান্নিধ্যে অবস্থান করা, কারণ যে কোন মুহূর্তে গুরুতর বিষয়ে মন্ত্রণার আবশ্যক হইতে পারে। বল্লভীর সর্বজনমান্য মন্ত্রিবর সে কথা জানেন না, এমন হইতে পারে না। জানিয়া শুনিয়াও তিনি আত্মগোপন করিয়াছেন: রাজার নিকটে ত তিনি নাই-ই; গৃহেও তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। শিলাদিত্যের মনে হইল—এ নরাধম বিশ্বাসঘাতক পারদগণের শিবিরে পলায়ন করিয়াছে। সূর্যকুণ্ডের গুপ্তকথা একমাত্র ঐ মন্ত্রীই জানিত; তাহারই পরামর্শে পারদেরা যে কুণ্ড অপবিত্র করিয়া দিয়াছে তাহাতে শিলাদিত্যের আর সংশয় রহিল না।

আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বিশ্বাসঘাতককে যোগ্য দণ্ড দেওয়া চাই। রাজাদেশে মন্ত্রীর পুত্রপরিজন তৎক্ষণাৎ নিহত হইল। তাঁহার প্রাসাদভবন হইল ভস্মীভূত। বিশ্বাসঘাতকের যথাসম্ভব দণ্ডবিধান করিয়া শিলাদিত্য সসৈন্যে শত্রু-সেনার সম্মুখীন হইলেন। প্রিয় বল্লভী রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণধার অসি-আস্ফালনে শত-সহস্র পারদ ভূমিসাৎ হইল।

শেষে অকস্মাৎ শত্রু-পক্ষের এক বর্শার আঘাতে তিনি রণক্ষেত্রে লুটাইয়া পড়িলেন।

চন্দ্রাবতীর মর্মর-প্রাসাদে আর তিনি পুষ্পবতীর সহিত মিলিত হইতে পারিলেন না! প্রিয়তমা মহিষীর সহিত একসঙ্গে বিন্ধ্য শৈলের শ্যামল শোভা দেখার সাধ আর এ-জন্মে পূর্ণ হইল না। সে সব সাধ অপূর্ণ রাখিযাই শিলাদিত্য চক্ষু বুজিলেন। বল্লভী নগরীর স্বাধীনতা লুপ্ত হইল। বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে সূর্যবংশের গৌরবসূর্য অস্তমিত হইল।

